৫। সূরা আর-রাদ ৪র্থ রুকু(২৭-৩১ আয়াত)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ ১৩ : ২৭
يَّشَآءُ ۖ﴿ وَ يَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ

২৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, তার রবের কাছ থেকে তার কাছে কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন? বলুন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যারা তার অভিমুখী তিনি তাদেরকে তার পথ দেখান।

আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলে তারা যে ধরণের নিদর্শন চাচ্ছে সেটা দিতে পারেন। [ইবন কাসীর] এমনকি হাদীসে এসেছে, যখন মক্কার কাফের কুরাইশরা চাইলো যে, আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। আমাদের জন্য ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিন। মক্কার পাশ থেকে পাহাড়গুলো সরিয়ে নিয়ে যান। যাতে সেখানে বাগান ও নদী-নালা পূর্ণ হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তা' আলা তাঁর রাসূলের কাছে ওহী পাঠালেন যে, হে মুহাম্মাদ! আপনি চাইলে আমি তাদেরকে তা প্রদান করব।

কিন্তু তারপর যদি তারা কুফরি করে তবে তাদেরকে এমন শাস্তি দেব যা আমি সৃষ্টিকুলের কাউকে কোনদিন দেইনি। আর যদি আপনি চান যে, আমি রহমত ও তাওবার দরজা খুলে দেই তবে তা-ই করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বরং তাদের জন্য রহমত ও তাওবার দরজা খোলা হোক। [মুসনাদে আহমাদ ১/২৪২] [ইবন কাসীর] সুতরাং নিদর্শন পাওয়াই বড় কথা নয়, হিদায়াত নসীব হওয়াই বড় কথা। তাই তো আল্লাহ তাদের জন্য নিদর্শন না দিয়ে রহমত ও তাওবার রাস্তা খোলা রেখেছেন। পরবর্তীতে মক্কাবাসীদের অনেকেই সে রহমতে ধন্য হয়।

যে নিজেই আল্লাহর দিকে রুজু হয় না বরং তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, হিদায়াত গ্রহণ করতে চায় না, তাকে জোর করে সত্য-সঠিক পথ দেখানো আল্লাহর রীতি নয়। যারা আল্লাহর পথের সন্ধান করে ফিরছে তারা নিদর্শন দেখতে পাচ্ছে এবং নিদর্শনসমূহ দেখেই তারা সত্য পথের সন্ধান লাভ করছে। তোমাদের কাছে যদি যাবতীয় নিদর্শনও আনা হয় তবুও তোমরা ঈমান আনবে না। [দেখুন, মুয়াসসার; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না। [সূরা ইউনুসঃ ১০১]

অন্য আয়াতে এসেছে, “নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে আপনার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না, যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, এমনকি তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে।” [সূরা ইউনুসঃ ৯৬-৯৭]

আল্লাহ আরো বলেনঃ “আমি তাদের কাছে ফিরিশতা পাঠালেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে হাযির করলেও আল্লাহর ইচ্ছে না হলে তারা কখনো ঈমান আনবে না; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ। [সূরা আল-আনআমঃ ১১১]

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ تَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ ১৩ : ২৮

২৮. যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়

তারা যে নিদর্শন চাচ্ছে তেমনি কোন নিদর্শন ছাড়াই যারা ঈমান আনে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুর স্মরণ অর্থাৎ যিকির করে আর যে করে না তাদের উদাহরণ হলো জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির ন্যায়। [বুখারীঃ ৬৪০৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ “যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশতবার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী পাঠ করবে, তার গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনাতুল্যও হয় তবুও আল্লাহ দয়া করে তা ক্ষমা করে দিবেন।” [বুখারীঃ ৬৪০৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, যে ব্যক্তি দিনে একশতবার ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর’ পড়ে সে ব্যক্তি দশটি দাস স্বাধীন করার সওয়াব পাবে, তার জন্য একশটি নেকী লিখা হবে এবং তার একশটি গুণাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। ওই দিন সন্ধা পর্যন্ত শয়তান থেকে তার রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হবে এবং তার চেয়ে উত্তম আর কেউ হবে না। তবে যে ব্যক্তি এটা তার চেয়ে বেশী পড়ে সে ব্যতিত” । [বুখারীঃ ৬৪০৩]

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوۡبٰى لَهُمۡ وَ حُسۡنُ مَاٰبٍ ১৩ : ২৯

২৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদেরই জন্য রয়েছে পরম আনন্দ এবং সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল।

মূলে বলা হয়েছে, (طُوبَىٰ لَهُمْ) বা তাদের জন্য রয়েছে ‘তুবা’ । এখানে তুবা শব্দ দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে

এসেছে যে, এর অর্থঃ তাদের জন্য রয়েছে খুশী ও চক্ষু সিক্তকারী। ইকরিমা বলেন, এর অর্থঃ তাদের জন্য যা আছে তা কতইনা উত্তম! দাহহাক বলেন, এর অর্থঃ তাদের জন্য ঈর্ষান্বিত হওয়ার মত নেয়ামত। ইবরাহীম নাখায়ী বলেন, এর অর্থঃ তাদের জন্য কল্যাণ। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তুবা হলো জান্নাতের একটি গাছের নাম। [ইবন কাসীর]

তবে নিঃসন্দেহে এ সমস্তের মূল অর্থঃ জান্নাত। কারণ জান্নাত এ সবগুলোর সমষ্টি। জান্নাতের নেআমত অগণিত, অসংখ্য। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আল্লাহ্ তাআলা সর্বশেষে জান্নাতে গমনকারীকে বলবেন, তোমার যাবতীয় আকাংখা আমার কাছে ব্যক্ত কর। সে লোক চাইতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত যখন তার চাহিদা শেষ হয়ে যাবে। তার আর চাওয়ার কিছু থাকবে না তখন আল্লাহ্ তা’আলা তাকে বলবেনঃ এটা থেকে চাও, ওটা থেকে চাও, এভাবে তাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিবেন। তারপর তিনি তাকে এসব দিয়ে বলবেন। তোমাকে এসবকিছু এবং এগুলোর দশগুণ দেয়া হলো” । [বুখারীঃ ৮০৬, ৮৪৩৭, ৮৪৩৮, মুসলিমঃ ১৮২]

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তা’আলা বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী, জিন ও মানব সবাই যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কাছে চাইতে থাক, তারপর আমি তাদের সবাইকে তাঁর প্রার্থিত বস্তু প্রদান করি, তবে তা আমার রাজত্বের কিছুই কমাবে না। তবে এতটুকু যতটুকু সুই সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে কমাতে পারে। [মুসলিম: ২৫৭৭]

كَذٰلِكَ اَرۡسَلۡنٰكَ فِىۡۤ اُمَّةٍ قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِهَاۤ اُمَمٌ لِّتَتۡلُوَا۟ عَلَيۡهِمُ الَّذِىۡۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ وَ ১৩ : ৩০
هُمۡ يَكۡفُرُوۡنَ بِالرَّحۡمٰنِ ؕ قُلۡ هُوَ رَبِّىۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَ اِلَيۡهِ مَتَابِ

৩০. এভাবে আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির প্রতি যাদের আগে বহু জাতি গত হয়েছে, যাতে আমরা আপনার প্রতি যা ওহী করেছি, তা তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন। তথাপি তারা রহমানকে অস্বীকার করে। বলুন, তিনিই আমার রব; তিনি ছাড়া অন্য কোন হক্ক ইলাহ নেই। তারই উপর আমি নির্ভর করি এবং তারই কাছে আমার ফিরে যাওয়া।

অর্থাৎ তাঁর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আছে। তাঁর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছে। তাঁর দানের জন্য অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। তারা নতুন কিছু করছে না, তাদের পূর্বেও আমরা অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি। তারা যেভাবে দয়াময় প্রভুকে ভুলে শাস্তির অধিকারী হয়েছে তেমনিভাবে আপনার জাতির কাফেররাও রহমান

তথা দয়াময় প্রভুকে অস্বীকার করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে তাদের শাস্তি অনিবার্য। [এ সংক্রান্ত আরো আয়াত দেখুন, সূরা আন-নাহলঃ ৬৩, সূরা আল-আনআমঃ ৩৪]

আয়াতে বলা হয়েছে, যে তারা “রাহমান” কে অস্বীকার করছে। এখানে মূলতঃ তারা আল্লাহ তা’আলাকে “রাহমান” বা অত্যন্ত দয়ালু এ গুণে গুণান্বিত করতে অস্বীকার করছিল। এটা ছিল আল্লাহর নাম ও গুণের সাথে শির্ক করা। কুরআনের অন্যত্র স্পষ্টভাবে এসেছে যে, তারা এ নামটি অস্বীকার করত। যেমন, “যখনই তাদেরকে বলা হয়, সিজদাবনত হও রহমান এর প্রতি, তখন তারা বলে, রহমান আবার কে? তুমি কাউকেও সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করব? এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।” [সূরা আল-ফুরকানঃ ৬০] হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ও কাফেররা আল্লাহর এ গুণটি লিখা নিয়ে আপত্তি করেছিল এবং বলেছিলঃ আমরা রহমানকে চিনি না। [বুখারীঃ ২৭৩১-২৭৩২]

অথচ এ নামটি এমন এক নাম যে নাম একমাত্র তাঁর জন্যই ব্যবহার হতে পারে। আর কাউকে কোনভাবেই রহমান নাম বা গুণ হিসেবে ডাকা যাবে না। আর এজন্যই আল্লাহ তা’আলা তাঁর রাসূলকে বলছেন যে, তারা যদিও গোয়ার্তুমি করে এ নামটি অস্বীকার করছে আপনি তাদেরকে এ নামটি যে আমার তা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তুলে ধরুন এবং বলুনঃ তিনিই আমার রব; তিনি ছাড়া অন্য কোন হক্ক ইলাহ নেই। তারই উপর আমি নির্ভর করি এবং তারই কাছে আমার ফিরে যাওয়া। তোমাদের অস্বীকার তার এ নামকে তার জন্য সাব্যস্ত করতে কোন ভাবেই ব্যাহত করতে পারবে না।

অন্যত্র বলা হয়েছে, “বলুন, তোমরা আল্লাহ নামে ডাক বা রাহমান নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাক সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। তোমরা সালাতে স্বর উচ্চ করো না এবং খুব ক্ষীণও করো না; দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো। [সূরা আল-ইসরাঃ ১১০] আল্লাহ আরো বলেনঃ বলুন, তিনিই দয়াময়, আমরা তার প্রতি বিশ্বাস করি ও তারই উপর নির্ভর করি। [সূরা আল-মুলকঃ ২৯] আর এ নামটি সবচেয়ে বেশী মহিমান্বিত নাম হওয়াতে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, “আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে ’আবদুল্লাহ ও আব্দুররাহমান।” [মুসলিমঃ ২১৩২]

وَ لَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ ১৩ : ৩১
لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ لَا

ۗ يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

৩১. আর যদি কুরআন এমন হত যা দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা যমীনকে টুকরো টুকরো করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, কিন্তু সব বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত তবে কি যারা ঈমান এনেছে তারা জানে না যে, আল্লাহ ইচ্ছে করলে সবাইকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন? আর যারা কুফর করেছে তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, অথবা বিপর্যয় তাদের আবাসের আশেপাশে আপতিত হতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এসে পড়বে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

এখানে উত্তর উহ্য আছে। কিন্তু উহ্য পদটি নির্ধারণে বিভিন্ন মত এসেছে।

এক. কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ হবেঃ যদি কুরআন এমন হত যা দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা যমীনকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করত না, তারা রহমানের সাথে কুফরী করত। [কুরতুবী] পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, “আর তারা রহমানের সাথে কুফরী করছে” এ বাক্যটি উপরোক্ত অর্থের স্বপক্ষে জোরালো দলীল।

দুই. কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ হবেঃ ”যদি কোন কুরআন এমন হত যা দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত তা হলে তা এ কুরআনই হতো। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] কারণ, এ কুরআনে নিহিত রয়েছে চ্যালেঞ্জ। জিন ও মানব এর মত বা এর একটি সূরার মত কিছু আনতে অপারগ। সে হিসেবে কুরআন শব্দ দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবকেই বুঝানো হবে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র কুরআন শব্দটিকে পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ যেভাবে আমরা নাযিল করেছিলাম বিভক্তকারীদের উপর; যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে। [সূরা আল-হিজরঃ ৯০-৯১]

আবার কোন কোন সহীহ হাদীসেও পূর্ববর্তী কোন কোন কিতাবকে কুরআন নাম দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাউদ আলাইহিস সালামের উপর পড়াকে এতই সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তিনি তার বাহনের লাগাম লাগানোর নির্দেশ দিতেন। আর তা লাগানোর পূর্বেই তার কুরআন পড়া শেষ হয়ে যেত” । [বুখারী ৩৪১৭] এখানে কুরআন বলে নিঃসন্দেহে তার কাছে নাযিলকৃত কিতাব যাবুরকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থের দিক থেকেও পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহকে কুরআন বলা যায়। কারণ, কুরআন শব্দের অর্থ, জমা করা। সে সমস্ত

গ্রন্থসমূহে আয়াত জমা করার পর তা কুরআনে পরিণত হয়েছে। [ইবন কাসীর] এ অর্থের আরেকটি দলীল হলোঃ قرآناً শব্দের تنوين কারণ, এ তানভীনকে تنكير হলে তা আমাদের পরিচিত কুরআনকে বুঝানো হয়নি বলেই ধরে নিতে হয়।

মূলত: এর কারণ হচ্ছে, সবকিছু আল্লাহ্ তা’আলার নিয়ন্ত্রণে। তিনি চাইলে তা হবে আর না চাইলে হবে না। তিনি যার হিদায়াত চান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর তিনি যার ভ্রষ্টতা চান তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারবে না। [ইবন কাসীর] কারণ, তারা যে সব মু’জিযা প্রত্যক্ষ করেছে, সেগুলো এর চাইতে কম ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আজ্ঞাবহ করার চাইতে অনেক বেশী বিস্ময়কর। এমনিভাবে নিষ্প্রাণ কংকরের কথা বলা এবং তাসবীহ পাঠ করা কোন মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিকতর বিরাট মু’জিযা। মি’রাজের রাত্রিতে মসজিদুল আকসা, অতঃপর সেখান থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, সুলাইমান আলাইহিস সালামের বায়ুকে বশ করার মু’জিযার চাইতে অনেক মহান। কিন্তু যালেমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

আয়াতের মূলশব্দ হচ্ছে, ييأس শব্দটির যে অর্থ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] সে অনুসারে অর্থ হবে, ঈমানদারগণ কি জানে না যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকেই নিদর্শন দেখানো ছাড়াই হিদায়াত দিয়ে দিতে পারেন? [কুরতুবী] তাছাড়া শব্দটির অন্য আরেকটি অর্থ হলো, নিরাশ হওয়া। তখন আয়াতের ভাবার্থ এভাবে বলতে হবে যে, মুসলিমগণ মুশরিকদের হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি? আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকেই হেদায়েত প্রদান করতেন। কারণ, মুসলিমরা কাফেরদের পক্ষ থেকে বার বার নিদর্শন দেখাবার দাবী শুনতো। ফলে তাদের মন অস্থির হয়ে উঠতো। তারা মনে করতো, আহা, যদি এদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া হতো যার ফলে এরা মেনে নিতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! [কুরতুবী] বস্তুত: যারা কুরআনের শিক্ষাবলীতে, বিশ্ব-জগতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে, নবীর পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবনে, সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জীবনধারায় কোন সত্যের আলো দেখতে পাচ্ছে না, তোমরা কি মনে করো তারা পাহাড়ের গতিশীল হওয়া, মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া এবং কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসার মত অলৌকিক ঘটনাবলীতে কোন আলোর সন্ধান পাবে? আবুল আলীয়া বলেন, এর অর্থ অবশ্যই ঈমানদাররা তাদের হিদায়াত সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে, তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে তিনি হিদায়াত দিতে পারেন। [ইবন কাসীর]

قَارِعَةٌ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য, আকাশ থেকে শাস্তি নাযিল হওয়া। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া [ইবন কাসীর] অথবা এর অর্থ, বিপদাপদ। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তাদের উপর আপদ-বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহর ওয়াদা কোন সময়ই টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমন কি, পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে। তবে হাসান বসরীর মতে, ওয়াদার অর্থ এ স্থলে কেয়ামতও হতে পারে। [ইবন কাসীর] এ ওয়াদা সব নবীগণের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সেই কেয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফের ও অপরাধী কৃতকর্মের পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করবে।

অর্থাৎ তিনি রাসূলদের সাথে যে সমস্ত ওয়াদা করেছেন সেটা তিনি ভঙ্গ করেন না। তিনি তাদেরকে ও তাদের অনুসারীদেরকে সাহায্য সহযোগিতার যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই ঘটবে। চাই তা দুনিয়াতে হোক বা আখেরাতে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ সেটা বলেছেন, সুতরাং আপনি কখনো মনে করবেন না যে, আল্লাহ তার রাসূলগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। [সূরা ইবরাহীমঃ ৪৭]